Vol. 44 | No. 1 | 2000

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শৈবলিনী

Volume	44
Issue	1
Year	2000
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মাহমুদা খাতুন
Published online	October 1, 2000
DOI	10.62328/sp.v44i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i1.1
Pages	১-২০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

শৈবলিনী

মাহমুদা খাতুন*

ভাগীরথীতীরে আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নব দুর্বল শয্যায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল—চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, আকাশ নদী বৃক্ষ দেখিয়া, আবার সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালকের নাম প্রতাপ—বালিকার শৈবলিনী। শৈবলিনী তখন আট বৎসরের বালিকা প্রতাপ কিশোর বয়স্ক।

এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসের উপক্রমণিকা অংশ আরম্ভ করিয়াছেন। কিশোর প্রতাপ, বালিকা শৈবলিনীতে নানা ছেলেখেলা চলে। শৈবলিনী তাহার মধুর কণ্ঠে পাপিয়ার ডাক অনুকরণ করিয়া ডাঙ্গার কূলের আম্রকানন কম্পিত করিয়া তোলে, প্রতাপ তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হয়। বন্য কুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া শৈবলিনী খেলার ছলে প্রতাপকে পরায়, মালার বিনিময়ে প্রতাপ পক্ষীশাবক পাড়িয়া আনিয়া বালিকার মনোরঞ্জন করে। সন্ধ্যার কোমল আকাশে তাহারা একসাথে তারা গণনা করে, গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া নৌকা অলস কৌতূহলে দেখিতে দেখিতে সময় কাটাইয়া দেয়। প্রকৃতির কোলে এই ছেলেখেলা হইতেই ভালোবাসা জন্মাল। যদি বাধা না পাইয়া এই ভালোবাসা সময়ে বিবাহে পরিণতি লাভ করিত, তবে তাহা সর্ব দিকে সুখের হইত। প্রতাপ শৈবলিনী উভয়ে উভয়কে পাইয়া পৃথিবীতেই স্বর্গ রচনা করিত। কিন্তু *চন্দ্রশেখর* নামক বেদনার কাব্যখানি সৃষ্টি হইত না।

বাল্যপ্রণয় বুঝি অভিশপ্ত। সেই জন্য ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও প্রতাপ শৈবলিনীর বিবাহ হইল না। প্রতাপ জানিত বিবাহ হইবে না, শৈবলিনী তাহার জ্ঞাতি কন্যা। বয়স একটু বাড়িলে শৈবলিনীও জানিল, বিবাহ হইবে না, প্রতাপ শৈবলিনীতে অনেক পরামর্শ করিল, এইজন্মে পরস্পরকে পাইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া একসাথে আত্মবিসর্জনই একমাত্র পথ মনে করিল। বাল্যের, কৈশোরের প্রিয় সঙ্গী, প্রণয়ের সাক্ষী গঙ্গাবক্ষেই জীবন বিসর্জন দেওয়া তাহারা স্থির করিল। দুই জনেই সন্তরণ পটু, সাঁতার দিয়া বহুদূর একত্রে গেল। প্রতাপ বলিল, "শৈবলিনী এই আমাদের বিয়ে", বলিয়া প্রতাপ ডুবিল। বারো বৎসরের শৈবলিনী বালিকাই, ভয় পাইল, ডুবিল না, তীরে ফিরিয়া আসিল। প্রতাপকেও মরিতে হইল না, নিয়তি প্রেরিত হইয়া চন্দ্রশেখর জলমধ্য হইতে প্রতাপকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু শৈবলিনী আর প্রতাপকে মুখ দেখাইল না। চন্দ্রশেখর বিশ বৎসরের ব্যবধানে বারো বৎসরের শৈবলিনীকে রূপে

* অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিলেন। "সৌন্দর্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয় ?" এই পর্যন্ত *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসের ভূমিকা, উপক্রমণিকার অংশ। বিবাহের আট বৎসর পরে উপন্যাসের যবনিকা উঠিয়াছে— এখন শৈবলিনী বিশ বৎসর বয়স্ক পূর্ণ যুবতী, চন্দ্রশেখরের গৃহের গৃহিণী, প্রতাপও ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখরের স্নেহ লাভ করিয়া তাঁহার মধ্যস্থতায় বিবাহ করিয়াছে।

চন্দ্রশেখর উপন্যাস একটি নারীর, শৈবলিনীর, জীবন-বেদনার অপরূপ কাব্য। *কপালকুণ্ডলা* ব্যতীত বঙ্কিমের কবিত্বের এমন উদাহরণ আর নাই। বাল্য প্রণয়ের অভিশাপ ললাটে আঁকিয়া শৈবলিনীর, গ্রন্থ নায়িকার, আত্মপ্রকাশ— তাহার আকাঙ্ক্ষা ও অশ্রুই উপন্যাসের মূলকথা। বঙ্কিম উপন্যাসে সাধারণভাবে মানবজীবন সম্পর্কে একটি গভীর বেদনাবোধ, আপনার আচরণজনিত অথবা ভাগ্যনির্দিষ্ট দুঃখ পরিণতি লক্ষ করা যায়। অবিচ্ছিন্ন সুখ শুধু কল্পনাতেই থাকে, আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির কোন স্থির অনুপাত নাই, তবুও জীবন থামিয়া থাকে না। *দুর্গেশনন্দিনী* হইতে *সীতারাম* বঙ্কিমের এই ট্র্যাজিক চেতনা সর্বত্র অনুভূত হয়। বিশেষ করিয়া তাঁহার নারী চরিত্রগুলি আয়েষা, কপালকুণ্ডলা, কুন্দ, ভ্রমর, শান্তি, শ্রী সকলেই অসহায়তা, জীবনজটিলতা, বেদনা ও আকাঙ্ক্ষাকে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন— "কাব্যগ্রন্থ মনুষ্য জীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র"— শৈবলিনী, চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের জীবনের কঠিন সমস্যার ব্যাখ্যা রহিয়াছে *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসে। তবুও অনুভব করা যায় এই উপন্যাস অনেকাংশেই শৈবলিনীর জীবনেরই বেদনার আলেখ্য। সীমাহীন বেদনা ও ব্যর্থতাই তাহার জীবন পরিণতি। *চন্দ্রশেখর* উপন্যাস শৈবলিনীর হৃদয়েরই দীর্ঘ বিলাপ- ধ্বনির কাব্য।

চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) বঙ্কিমচন্দ্রের পঞ্চম উপন্যাস, *যুগলাঙ্গুরীয়* ও *ইন্দিরা* বাদ দিলে। *চন্দ্রশেখরে* রোমান্স রচনার প্রবণতা অবশ্যই লক্ষ করা যায়—রোমান্সের ঘন বর্ণেই এই উপন্যাস চিত্রিত, অতীতকালের মানুষের আদর্শ, বুদ্ধি ও বাস্তব জীবনের সংকটের চিত্র ধরা আছে, এই উপন্যাসে। পলাশীর যুদ্ধের পরে বাংলার সর্বব্যাপী সংকট, রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বড় পরিবর্তন এই উপন্যাসের অংশ। বাংলার রাজধানী ও রাজধানী হইতে দূরের একটি গ্রাম পর্যন্ত ইহার কাহিনী বিস্তৃত। বাংলার নবাব হইতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখর এই উপন্যাসের চরিত্র। কিছু ঐতিহাসিক চরিত্র আছে—নবাব মীর কাসেম, তাঁহার বেগম, কয়েকজন ইংরেজ, নবাবের কিছু কর্মচারী। প্রতাপ, শৈবলিনী, চন্দ্রশেখর, রামানন্দ স্বামী কাল্পনিক চরিত্র; ঐতিহাসিক না-হইলেও উপন্যাসের সময়ের সহিত বেমানান নহে। *চন্দ্রশেখরে* বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের সীমানাকে অতিক্রম করিয়া জীবনের সর্বাত্মক সংকটকে প্রকাশ করিয়াছেন। রাজনৈতিক কারণে, অর্থনৈতিক সংঘাতে সুদূর গ্রামজীবন পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়াছে; রাজকর্মচারী অথবা ইংরেজ কর্মচারীর অত্যাচারে, অর্থলোভে সাধারণ মানুষের জীবনের বিড়ম্বনার বিবরণও এই উপন্যাসে আছে। সংকট রাষ্ট্রের, সমাজের, ব্যক্তির। নবাব মীর কাসেম রাজনৈতিক নয় কেবল, নবাব হইয়াও ব্যক্তিগত সংকটের আবর্তে পতিত, পরাজিত। দলনী বেগম, প্রতাপ, শৈবলিনী, চন্দ্রশেখর সকলেই আদর্শ ও বাস্তব জীবনের সংকটে পর্যুদস্ত। এই বৃহৎ বিস্তৃত পটভূমিকা *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসের শিল্পগৌরব। বঙ্কিমচন্দ্র মূলত উপন্যাস লেখক, তাঁহার রচিত রোমান্সে দূর অতীতের চরিত্রসমূহের জীবনসংকট, তাহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, বেদনা, ব্যর্থতার

পরিচয় ধরা আছে। সাধারণত রোমান্সে এতটা পাওয়া যায় না। বাঙালির বীরত্ব ও মহত্ত্ব ইতিহাসের বিস্মৃত পটভূমিকায় *চন্দ্রশেখর* ও অন্যান্য উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে অবশ্যই, কিন্তু একই সাথে উপন্যাসের চরিত্রগুলির জীবনসমস্যা তাহাদের দ্বন্দ্ব ও সংকট এমন নিবিড় ও সামগ্রিকভাবে প্রকাশিত যে তাহারা ইতিহাসের সময়সীমা অতিক্রম করিয়া আমাদের জীবনপ্রান্তে দাঁড়ায়—তাহাদের বেদনা আমাদের বেদনাতে মিশিয়া এক হইয়া যায়। ইতিহাসের বক্তব্য আছেই—হিন্দুর নবজাগরণের কালে বঙ্কিম জাতিকে কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবেনই; কিন্তু সে বক্তব্য অপেক্ষা তাহার বর্ণিত মানবজীবনের আকুতি, বেদনা ব্যর্থতাই আমাদের অভিভূত করে বেশি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার কারণেই দূর কালের হৃদয় সমস্যা বর্তমানের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসের ইহাই মহত্তম শিল্প সার্থকতা।

॥ ২ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু জাতীয়তার বিকাশ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তরুণ বয়সে ইওরোপীয় মানবহিত ও জীবন উপযোগিতাবাদের প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। পরবর্তীকালে জাতির শিক্ষকের ভূমিকায় স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিয়া চলিলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মানববাদী প্রেরণা অন্তঃস্রোতা হইয়া তাঁহার রচনার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলি সেই চেতনার প্রমাণ। নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শের সংস্থাপন তাঁহার রচনার মূল উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই—কিন্তু তাঁহার ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ মনুষ্যত্বেরই সামগ্রিক চেতনাসম্ভূত। ধর্ম ও মনুষ্যত্বকে বঙ্কিম এক উৎস হইতে উৎসারিত মনে করেন। তিনি বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকেই ধর্মের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অনুসন্ধান করিয়াছেন। তরুণ বয়সের ইওরোপীয় দর্শনের প্রভাব একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। সেইজন্য আধুনিক যুক্তিবাদ ও তত্ত্বানুসন্ধান প্রণালী 'কৃষ্ণচরিত্র' 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়' প্রাধান্য পাইয়াছে। "যাঁহারা বিবেচনা করেন, এ দেশীয় পূর্ব্বপণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্ত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।"[১] 'গীতার বাঙ্গালা টীকা' রচনা করিতে গিয়া এই পদ্ধতিই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সত্য ও সুসংগত জীবনাচরণই ধর্ম। হিন্দুধর্মে ব্যক্তির আচরণের যে নির্দেশ আছে, স্বজাতি সমাজ ও পরজাতি সমস্যা সমাধানের যে ইঙ্গিত আছে এমন আর কোন ধর্মে নাই, আপন বিশ্লেষণের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র ইহা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার এই স্বাধীন বুদ্ধি ও মনুষ্যত্বের আদর্শে আলোকিত হিন্দু ধর্মের সহিত দেশাচার ও লোকাচার সমৃদ্ধ প্রচলিত হিন্দু ধর্মের মিল ছিল না। তাঁহার ধর্ম, তাঁহার ভাষায় "ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি ও হৃদয়ে শান্তি"— এই ধর্ম নীতিকে উদার বিশ্বধর্ম বলিতে বাধা নাই। তবুও বঙ্কিম-মানসে বুদ্ধি ও বিশ্বাসের সংকট অনুভূত হয়। একদিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, যাহা দ্বারা তিনি সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, বিদেশি শাসনের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক বৈষম্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন, অন্যদিকে প্রাচীন হিন্দু ধর্ম, হিন্দু ভারতবর্ষের স্বপ্নও না-দেখিয়া পারেন নাই। দ্বন্দ্ব, contradiction হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রেরই নয়, সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে,

বিদ্যাসাগরকে বাদ দিলে, সকল মানববাদীর ছিল। তাই আধুনিককালের যুক্তি-বুদ্ধির সহিত অতীতের প্রতি আনুগত্য বঙ্কিম মানসে দ্বিধা ও সংকট সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার শিক্ষকের ভূমিকার এইটিই হয়ত গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা। যুক্তি ও আবেগের ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহার অন্তর আলোড়িত হইয়া জীবনদ্বন্দ্বের এক বিচিত্র রূপ উপন্যাসে ধরা পড়িয়াছে। পুরাতন আদর্শ ও নবীন চেতনা কোনটিই তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই, উভয় চিন্তার বিরোধের মধ্যেই জীবনের অভিনব ব্যাখ্যার সূত্র রহিয়াছে।

॥ ৩ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাসের মত *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসেরও একটি সমস্যা রহিয়াছে। সমস্যাটি জটিল ও অভিনব—একেবারে আমাদের পরিবারের মূল কেন্দ্রে ইহার অবস্থান, দম্পতির ঘনিষ্ঠজীবন সম্পৃক্ত। ইতঃপূর্বে *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইলেন, কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে ভালবাসিতে পারে নাই। পরে সূর্যমুখী, ভ্রমর, শ্রী অথবা প্রফুল্ল স্বামীর কার্যের নিন্দা করিয়াছে। কিন্তু অন্যপুরুষে তাহাদের আসক্তি ছিল না। হিন্দু সতীধর্ম অর্থাৎ দেহমনে স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠা কোথাও লঙ্ঘিত হয় নাই। কিন্তু *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসের দাম্পত্য সমস্যা সত্যই অভিনব। শৈবলিনী ও প্রতাপে বাল্যকালেই অগাধ প্রণয়। বিবাহ সম্ভব নয়, কারণ শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা। রূপের কারণে দরিদ্রকন্যা শৈবলিনীর বিবাহ হয় চন্দ্রশেখরের সহিত। বিবাহের আট বৎসর পরে শৈবলিনী যখন পাঠকের সম্মুখে আসে, জানা যায়, শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিতে পারে নাই, প্রতাপেই তাহার প্রণয়; স্বামীকে শুধু ভক্তি দিয়াছে। দুরন্ত প্রণয় আবেগে শৈবলিনী প্রতাপের জন্য গৃহত্যাগ করে। শৈবলিনীর প্রণয় 'পাপ', সে পাপীয়সী; 'প্রায়শ্চিত্তের' পরে স্বামীগৃহে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ধর্মীয় ও নৈতিক স্খলনের জন্য বঙ্কিম শৈবলিনীর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, অথচ তাহাকে কখনই অশুচি হীন করিয়া অঙ্কন করেন নাই। শৈবলিনী অকলঙ্কিত প্রণয় প্রতিমাই রহিয়াছে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের দাম্পত্য নীতির অলঙ্ঘনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগিবেই।

পরিবারকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই দেশে দাম্পত্য সম্পর্কের মূল অত্যন্ত গভীর। নানা প্রকারের অনুশাসনের ফলে দাম্পত্য বন্ধন হিন্দু সমাজে অত্যন্ত দৃঢ়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সাধারণভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক অতি পবিত্রও। স্ত্রী পুরুষে ভালোবাসা, প্রেম, তাঁহার মতে, ধর্মীয় আচরণ। বঙ্কিমের নিজের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখের ছিল। জীবনসঙ্গিনী রূপে স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী (প্রথম স্ত্রী বালিকা বয়সেই গত হন) সুখে দুঃখে বঙ্কিমের প্রধান সহায় ছিলেন। স্ত্রীর প্রতি যথার্থ ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও সম্মানবোধ বঙ্কিম মানসে স্ত্রী জাতি সম্পর্কে একটি বিশেষ চেতনা গড়িয়া তুলিয়াছিল অনুমান করি। পবিত্র দাম্পত্য বন্ধনের মধ্যে স্ত্রীকে একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তিনি; তাঁহার মতে, স্ত্রী 'বাল্যের ক্রীড়া সঙ্গিনী' 'যৌবনে সংসার সৌন্দর্য প্রতিমা,' 'বার্দ্ধক্যে জীবনাবলম্বন'। জীবনে মরণে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্ত্রীর সহিত পুরুষের। জীবনে জীবনে যোগ হইয়া যাওয়াই যথার্থ দাম্পত্য। তবু নিয়মে নিষেধে জীবন চলে না, শৃঙ্খলা ও প্রেমপূর্ণ দাম্পত্য জীবনও ব্যাহত হয়—আসে যন্ত্রণা,

জটিলতা ও বিচ্ছেদ। বঙ্কিমচন্দ্র এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার উপন্যাসে মানবজীবনের এই গভীরতম সত্তার বিচিত্র ও পূর্ণ বিবরণ আছে।

দাম্পত্য সংকট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাসেই উপস্থিত। *কপালকুণ্ডলায়* নবকুমার বিবাহিতা স্ত্রী কপালকুণ্ডলার নাগাল পায় না, *বিষবৃক্ষে* স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করে। *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসে গোবিন্দলালের রূপতৃষ্ণার দাহে ভ্রমরের সুখের ঘর ভস্মীভূত হয়। *সীতারামের* অধঃপতন তার স্ত্রীর বিরাগের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। স্ত্রী পুরুষের মিলিত জীবনে কত সংকট, বেদনা, ব্যর্থতা। বঙ্কিমের বিবাহিতা নারী—কপালকুণ্ডলা, সূর্যমুখী, ভ্রমর, প্রফুল্ল, শ্রী—আপনার অধিকার সম্পর্কে সর্বদা সচেতন, পুরুষের স্বেচ্ছাচারকে সর্বদা প্রশ্ন করিয়াছে বিরোধের মূল সূত্র এই অধিকার চেতনায়, ন্যায় ও মর্যাদা বোধের প্রশ্নে। কপালকুণ্ডলার কথাই ধরি। সে অরণ্যকন্যা, কাপালিক-পালিতা। সংসার উদ্যানে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বাঁচাইতে পারিলনা, স্ত্রীর প্রতি অপরিমিত ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও। কারণ স্বভাবে করুণাময়ী হইয়াও কপালকুণ্ডলার হৃদয় প্রেমশূন্য, অন্তরে নবকুমার নাই। সে সংসার চাহেনা, স্বামী প্রেম চাহেনা, সন্তান আকাঙ্ক্ষা কী সে জানে না। সংসারে খাপ খাইল না বলিয়াই নদীবক্ষে তাহার নিমজ্জন। সূর্যমুখী স্বামীকে ভালবাসে, স্বামীর চলিবার পথে আপনার হৃদয়টি পাড়িয়া দিতে সর্বদাই সে উন্মুখ: তবু স্বামীর সুখের দ্বিতীয় বিবাহের পরে সে গৃহত্যাগ করে। ভ্রমর এত ভালবাসা সত্ত্বেও স্বামীর সামান্য দোষ মানিয়া লয় না। যত দিন শ্রদ্ধার যোগ্য ততদিনই সে স্বামীর শ্রদ্ধা করিবে এই ঘোষণা দেয়। অনুতপ্ত স্বামীকে দূরে রাখিল—এত দুঃখ দিয়া ও পাইয়া। জীবনের এই নিবিড় পরিচয় দানে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথাগত চিন্তাধারা অপেক্ষা আধুনিক বিচার বুদ্ধির উপরই নির্ভর করিয়াছেন। পতিব্রতা স্ত্রীর সনাতন আদর্শ অটুট রাখা অপেক্ষা জীবনমহিমা প্রকাশই তাঁহার শিল্পানুভূতির প্রকৃত রূপ। তাই বঙ্কিমের নারী চরিত্রগুলি স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও সাহসী। আপনার অধিকার ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করিতে তাহারা কুণ্ঠাবোধ করে না। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাহসিনী শৈবলিনী, চন্দ্রশেখরের স্ত্রী।

বঙ্কিমের উপন্যাস সম্পর্কে আমাদের বিস্ময় আর শেষ হয় না। এতকাল পরেও তাঁহার উপন্যাস পাঠে আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাঁহার বর্ণিত জীবন সমস্যার সামগ্রিকতা ও নিবিড়তায় এখনও আমরা আবিষ্ট হই। মানবভাগ্যের দুঃখপূর্ণ বর্ণনায় এমন আন্তরিকতা, এমন করুণাপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দুর্লভ। শৈবলিনী *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসের নায়িকা, শৈবলিনীর কথাই ধরা যাক। স্বামীকে ভালবাসে নাই, বাল্য প্রণয়ী প্রতাপে তাহার প্রাণ সমর্পিত, এই দোষে বঙ্কিম তাহাকে পাপীয়সী বলুন, তাহার অনন্যপরায়ণ প্রেমকে পাপ বলুন, যত নীতিকথাই উচ্চারিত হউক, শৈবলিনী আট বৎসর বয়স হইতেই প্রেম প্রতিমা। সংসার, স্বামী, সন্তানে তাহার আগ্রহ নাই, স্বামীকে শ্রদ্ধা করে সত্য, কিন্তু ভালোবাসে না। বরঞ্চ প্রতাপ বিহনে তাহার সংসার অরণ্য—অসংকোচে এই কথা ঘোষণা করে। শৈবলিনীর প্রেমই সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কারকও বটেন, কিন্তু শত শাস্তি দিয়াও শৈবলিনীকে তিনি ফিরাইতে পারেন নাই শেষ পর্যন্ত। অপরিমিত প্রেম, প্রাণশক্তি ও সাহস লইয়া বঙ্কিমসৃষ্ট সকল নারী চরিত্রের মধ্যে সে স্বতন্ত্র ও সর্বাধিক উজ্জ্বল। অথচ কিনা সে 'পাপীয়সী' তাহার

প্রেম 'পাপ'। 'প্রায়শ্চিত্ত' অধ্যায়ের পরেও তাহার প্রেম সমান বেগশালী। সতীধর্মের উপর প্রেমের জয় ঘটিয়াছে *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসে, এই জয় মানবধর্মের।

॥ ৪ ॥

চন্দ্রশেখর উপন্যাস একান্তভাবেই মানব হৃদয়ের বেদনার কাব্য। সে বেদনা শৈবলিনীর, তাহার জীবন বেদনাই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমের অচরিতার্থতায়, আপনার কারণে প্রিয় প্রাণনাশের হেতু হওয়ায়, কর্তব্যের গুরুভারের চাপে শৈবলিনীর বেদনা বর্ণনার অতীত। শৈবলিনীর জীবননাট্যের বিভিন্ন পর্ব উল্লেখ করিয়া তাহার অন্তরের বহ্নি দহনের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিব।

উপন্যাসের আরম্ভে উপক্রমণিকা অংশে দেখি প্রতাপ শৈবলিনী বিবাহ হইবেনা জানিয়া গঙ্গাবক্ষে একত্রে জীবন বিসর্জন দেওয়া স্থির করিল। প্রতাপ ডুবিল, শৈবলিনী পারিল না। সেই বয়সে স্বেচ্ছামৃত্যুর দৃঢ় মনোবল কোথা হইতে আসিবে?

> অনেক দূরে গিয়া প্রতাপ বলিল—'শৈবলিনী এই আমাদের বিয়ে।' শৈবলিনী বলিল— 'আর কেন এই খানেই।'
>
> প্রতাপ ডুবিল।
>
> শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল। মনে ভাবিল—কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।

প্রতাপকেও মরিতে হইল না। সে মরিতই, শৈবলিনীহীন জীবন হইতে মৃত্যুই শ্রেয়, কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহার জীবন রক্ষা করিলেন। অনেক পরে প্রতাপ সেই ঋণ আপনার জীবন দিয়া শোধ করিয়াছিল। কিন্তু বাঁচিয়া উঠিয়া শৈবলিনীর বড় লজ্জা, মর্ম বেদনা। "শৈবলিনী প্রতাপকে আর মুখ দেখাইল না"। প্রেমের অঙ্গীকার পালন করা হইল না—শৈবলিনীর চিত্তে পাপ নয়, এইটিই গোপন অপরাধবোধ. প্রতাপ জীবন বিসর্জন দিতে বসিয়াছিল, আমি পারিলাম না—এই বেদনা ও কাতরতা শৈবলিনীর অন্তরে সেই কোরক বয়স হইতেই সর্বদা জাগরূক ছিল। চন্দ্রশেখরের সহিত বিবাহ হইল ঠিকই, কিন্তু কেমন করিয়া সে সংসারধর্মে নিজেকে মগ্ন রাখে, কেমন করিয়া হৃদয় হইতে প্রতাপের স্মৃতি মুছিয়া স্বামীতে সমর্পিত হয়? প্রতাপকে সে ভুলিবে. সে কি সম্ভব হইবে কখনও? সেই জন্য বিবাহের পরে, বারো বৎসর হইতে বিশ বৎসর; প্রথম কৈশোর কাল হইতে পূর্ণ যৌবন—তাহার অন্তর প্রতাপময়, চন্দ্রশেখর সেখানে প্রবেশ পথ পান নাই, বাহিরেই রহিয়া গিয়াছেন।

চন্দ্রশেখর উপন্যাস ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ—শিরোনাম যথাক্রমে পাপীয়সী, পাপ, পুণ্যের স্পর্শ, প্রায়শ্চিত্ত, প্রচ্ছাদন, সিদ্ধি। পূর্বেই বলা হইয়াছে, গ্রন্থ নায়িকা শৈবলিনীই 'পাপীয়সী', তাহারই 'পাপ', 'পুণ্যের স্পর্শ' সেই-ই পায়, 'প্রায়শ্চিত্ত' তাহারই। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রতাপের সিদ্ধি—

> তবে যাও প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও যেখানে ইন্দ্রিয় জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেই খানে যাও। যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেই খানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্যময় লোকে যাও। লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালোবাসিতে চাহিবে না।

প্রতাপের পাপের প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্র উত্থাপন করেন নাই, কারণ সে ইন্দ্রিয় জয়ী। চন্দ্রশেখরের হিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। পাপীয়সী শৈবলিনী, বাল্য প্রণয় ভুলে নাই, মৃত্যুর পরে নয়, এই জীবনেই সে স্বামীত্যাগ করিয়া প্রতাপকে পাইতে চায়। উপন্যাস শেষে পাঠকের উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবাক্য না রাখিয়া পারেন না। *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসে প্রত্যেক প্রাঙ্গণের বিষবৃক্ষের বিষফলের কথা বলিয়া তিনি সকলকে সাবধান করিয়াছেন; গোবিন্দলাল ভ্রমরের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ হইয়াও বারো বৎসর সাধনার পর 'ভ্রমরাধিক ভ্রমর'কে পায়। আর প্রতাপ স্বার্থহীন জীবনদানের পরে মহৈশ্বর্যময় আনন্দলোকে অধিষ্ঠিত হয়; সেখানে এক শৈবলিনী কেন, লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পড়লেও সে আর ভালোবাসিতে চাহিবে না। এই সব সতর্ক নীতিকথাতে কিন্তু উপন্যাসের বড় একটা ক্ষতি হয় না, অকপট জীবন বর্ণনা, জীবনের অচরিতার্থতার বেদনা এমন একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্প পরিণতি আনে যে কয়েক পংক্তির নীতিবাণী বা সাবধান বাণী পাঠক ভুলিতে পারে। বঙ্কিম প্রতিভা এত বড় যে উদ্দেশ্যমূলকতা সত্ত্বেও তাঁহার উপন্যাস মানুষেরই কাহিনী। সেইজন্য প্রতাপের সিদ্ধির মহৈশ্বর্যলোক হইতে দুঃখ বঞ্চনা বেদনাপূর্ণ পৃথিবীই আমাদের টানে। ইন্দ্রিয়জয়ী প্রতাপ নয়, শত অপরাধে অপরাধিনী শৈবলিনীই আমাদের আদরণীয়া।

॥ ৫ ॥

বেদগ্রামে চন্দ্রশেখরের বাস। শৈবলিনীকে বিবাহ করার পর আট বৎসর গত হইয়াছে। শৈবলিনীকে রূপে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই মুগ্ধতা এখন অন্তর মধ্যে প্রগাঢ় ভালোবাসা। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সংসারের দায়মুক্ত হইয়া তিনি এখন শাস্ত্র অধ্যয়নে অধিক মনোযোগ দিতে পারেন। শৈবলিনী নিপুণা গৃহিণী—গৃহের যত্ন, পরিমার্জনা, স্বামীর সেবা কিছুতে ত্রুটি নাই। তবু চন্দ্রশেখর অন্তর মধ্যে একটু বিষণ্নতা বোধ করেন—বয়সের ব্যবধানজনিত দূরত্ব ভুলিতে পারেন না, স্ত্রীর যৌবনাকাঙ্ক্ষাসমূহ অতৃপ্ত— এই খেদ সর্বদা তাঁহার মনে। শৈবলিনীর ঘুমন্ত মুখে চাঁদের আলোর শোভা দেখিয়া তাঁহার মনে হয়—"তাহার গৃহ সরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে।" ক্ষণকালের জন্য অন্তর প্রফুল্ল হইলেও "শৈবলিনীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেখরের চক্ষে অশ্রু বহিল।" তিনি ভাবেন—"হায় কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ?"

উপন্যাসের প্রথম খণ্ডেই, পাপীয়সীতে শৈবলিনীর প্রতি চন্দ্রশেখরের অপরাধবোধ মিশ্রিত ভালোবাসার পরিচয় পাই। অপরাধবোধ কেন? গ্রন্থ রচনার, একশত দশ বৎসর পূর্বে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষের বিশ বৎসরের স্ত্রী কি নিন্দনীয় ছিল? বিশেষত চন্দ্রশেখর দৃঢ় স্বাস্থ্য সুপুরুষ ব্যক্তি

ছিলেন। দরিদ্রকন্যা শৈবলিনীর এইরূপ স্বামী পাওয়া ভাগ্যেরই ব্যাপার। বিশেষত গৃহ কণ্টকশূন্য ছিল, সপত্নী যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই, কোন তৃতীয় ব্যক্তিও শৈবলিনীর কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করার জন্য গৃহে উপস্থিত ছিল না। চন্দ্রশেখর ধনী না হইলেও সংসারে সচ্ছলতা ছিল। সেই কালে শৈবলিনীর ভাগ্য তো দেবতার আশীর্বাদ ধন্য। তবু চন্দ্রশেখরের আক্ষেপ। হয়ত চন্দ্রশেখর বলিয়াই আক্ষেপ। শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখরের গৃহে গৃহিণী পদে অধিষ্ঠিতাই আমরা দেখি। আপনার ঘরে সে সম্রাজ্ঞী। শৈবলিনী চরিত্র ধীরে ধীরে আপনার প্রতি আস্থাশীল ও সাহসী হইয়া উঠিয়াছে। ভীমা পুষ্করিণীতে সন্ধ্যাকালে লরেন্স ফষ্টর উপস্থিত হইলে শৈবলিনীর সখী সুন্দরী পালায়ন করে, কিন্তু শৈবলিনী বিচলিত হয় না—"ইংরেজকে দেখিয়া শৈবলিনী হেলিলনা—দুলিল না—জল হইতে উঠিল না। কেবল বক্ষঃ পর্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জন করিয়া আর্দ্র বসনে কবরীসমেত মস্তকের অর্দ্ধভাগ মাত্র আবৃত করিয়া প্রফুল্ল রাজীববৎ জল মধ্যে বসিয়া রহিল। মেঘ মধ্যে অচলা সৌদামিনী হাসিল—ভীমার সেই শ্যাম তরঙ্গে এই স্বর্ণকমল ফুটিল।" শৈবলিনীতে সৌন্দর্যের সহিত সাহসও আছে, এই কথা মনে রাখিতে হইবে।

উপন্যাসের একেবারে আরম্ভে, উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদেই শৈবলিনী গৃহচ্যুত হইয়াছে। গৃহে তাহার আশ্রয় ছিল, সুখ ছিলনা। চন্দ্রশেখর বয়স্ক ব্যক্তি, সেই জন্য নয়, স্বামীকে মানুষ হিসাবে সে শ্রদ্ধাই করে, কিন্তু প্রতাপকেই শৈবলিনীর চাই। সেজন্য সে মনে মনে চন্দ্রশেখরের নিকট অপরাধিনী, প্রেমহীন কর্তব্য পালন স্বামীকে অপমান করার সমান—এই রকম সে মনে মনে ভাবে। ফষ্টরের নৌকায় নাপিতানিবেশী সুন্দরীকে সে বলিতেছে—"দেখ, গৃহে থাকিতে মনে ভাবিতাম, যদি পিতৃমাতৃকুলে কাহারও অনুসন্ধান পাই, তবে তাহার গৃহে গিয়া থাকি। নচেৎ কাশী গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব—নচেৎ জলে ডুবিয়া মরিব।" দেখা যাইতেছে, শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের সহিত গৃহত্যাগ করিবার পূর্ব হইতেই সংসার উদাসিনী, কর্তব্য কর্ম মাত্র করে, সংসারে আসক্তি নাই। অপরিমিত প্রণয়াবেগ দীর্ঘকাল হইতে অন্তরে সঞ্চিত হইতেছিল। নদীতে বর্ষার জল যেমন তীরভূমিকে প্লাবিত করে, তেমনই শৈবলিনীর অন্তরে প্রতাপকামনা ক্রমাগত নদীর মতই স্ফীত হইতেছিল, লরেন্স ফষ্টর উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত একটি ঢেউ মাত্র, শৈবলিনীকে অনায়াসেই সংসার সীমা হইতে ভাসাইয়া দূরে আনিয়া ফেলিল। শৈবলিনী আর পিছনে তাকাইতে চাহেনা। লরেন্স ফষ্টরের নৌকা চন্দ্রশেখর হইতে তাহাকে দূরে টানিয়া লইয়া চলিল, প্রতাপ ঘাটে কোনরকমে পৌঁছিবে, ইহাই শৈবলিনীর শেষ আশা।

বেদগ্রামে, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর শান্ত, স্নেহ ও ভক্তিপূর্ণ গৃহটি অবশেষে লুণ্ঠিত হইল। প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে রাজকার্য সম্পন্ন করিয়া চন্দ্রশেখর গৃহে ফিরিতেছেন, কতদিনের অদর্শন, মনে ব্যাকুলতা "কতক্ষণে আবার শৈবলিনীকে দেখিব?" "যদি গিয়া দেখি শৈবলিনী নাই? —যদি গিয়া শুনি যে শৈবলিনী উৎকট রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে? তাহা হইলে আমি বাঁচিবনা।" আশঙ্কা সত্য হইল—তিনি দেখিলেন গৃহ লুণ্ঠিত, তাঁহার আশা ও আনন্দও লুণ্ঠিত। তাঁহার 'শৈবলিনী' ডাকের উত্তর দিবার জন্য কেহ সেখানে অপেক্ষা করিয়া নাই। কিন্তু পণ্ডিত, স্থিতপ্রজ্ঞ চন্দ্রশেখর নিজের জীবনকেও শূন্য নিরর্থক মনে করিলেন। একে একে গৃহসামগ্রী বিলাইলেন, "আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিত

তুল্য" প্রিয় গ্রন্থসমূহ একত্র করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন। "অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি, ন্যায় বেদান্ত সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ, একে একে সকলই অগিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতে লাগিল।" এত ভালোবাসা, শৈবলিনীর জন্য এত প্রেম! সহজে কি নারীভাগ্যে এই রাজঐশ্বর্য জোটে? শৈবলিনী এই ভালবাসাকে চিনিতে পারিলনা, চন্দ্রশেখরকে নিঃস্ব করিল—এই জন্যই কি বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে পাপীয়সী বলিয়াছেন? চন্দ্রশেখর শুধু স্বামীত্বের অধিকারে নয়, প্রকৃত ভালবাসার পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গৃহত্যাগিনী ভ্রষ্টা পত্নীর প্রতি তাঁহার মমতার অন্ত নাই, শৈবলিনীর 'প্রায়শ্চিত্ত' পর্বের পরে তাহা দেখা গিয়াছে।

চন্দ্রশেখর শৈবলিনী বিবাহিত দম্পতি,—তাহাদের মধ্যে ভালোবাসা থাকিবারই কথা, নাই কেন, দোষ কাহার? শৈবলিনী দোষী নয়, বালিকা বয়স হইতেই তাহার প্রাণ প্রতাপে সমর্পিত। চন্দ্রশেখর দোষী নহেন, দরিদ্র কন্যা শৈবলিনীকে মুগ্ধ হইয়াই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, সেকালের পক্ষে স্বামীগৃহে সম্মান, স্বাধীনতা ও স্বামী প্রেমের অভাব শৈবলিনীর ঘটে নাই। চন্দ্রশেখর বয়স্ক ব্যক্তি, অধ্যয়ন ও শাস্ত্রানুশীলনে তাঁহার অনুরাগ, ইহাতে সংসার সুখে বিপর্যয় ঘটিতে পারেনা। ভালোবাসাটাই বড় কথা। তবু ভক্তি ভালোবাসা বনিল না, ঘর ভাঙ্গিল। প্রতাপ কি দোষী? অবশ্যই প্রতাপ শৈবলিনীকে ভালোবাসে, কিন্তু পূর্ব সম্পর্ক স্থাপনে তাহার আগ্রহ নাই। অন্তরে যে অগ্নিই থাকুক, চন্দ্রশেখর তাহার শ্রদ্ধার পাত্র, চন্দ্রশেখরের উপকার ও আনুকূল্যে সে বিনম্র; সর্বোপরি রূপসী তাহার স্ত্রী। রূপসীর নিকট হইতে প্রতাপের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয় নাই। তবু শৈবলিনী প্রতাপকে আশা করিয়া গৃহত্যাগ করিল, চন্দ্রশেখর প্রাণ প্রতিমা শৈবলিনীকে হারাইলেন, সবশেষে প্রতাপ চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর সুখের জন্য স্বেচ্ছায় যুদ্ধে প্রাণ দিল। এই সর্বব্যাপী বেদনার জন্য কাহাকেও দায়ী করা যায় না। চন্দ্রশেখর ভিলেন নহেন। সমগ্র বঙ্কিম উপন্যাসে চন্দ্রশেখর একটি মহৎ চরিত্র—মানবিক মহত্ত্বে তিনি বিশিষ্ট। এতবড় শাস্ত্রদর্শী হইয়াও চন্দ্রশেখরের অন্তর স্নেহ, প্রেম ও ক্ষমায় পরিপূর্ণ। প্রতাপ ও শৈবলিনীর সম্পর্ক জানিয়াও ঘৃণার পরিবর্তে তাঁহার অন্তর সমবেদনা ও করুণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, শৈবলিনীকে হারাইয়া তাঁহার চিত্তদহন ও প্রতাপের জন্য আন্তরিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা—সবই চন্দ্রশেখর চরিত্রের উচ্চ ভাবের পরিচায়ক। নবাবের দরবার হইতে বেদগ্রাম পর্যন্ত তাঁহার শ্রদ্ধার আসন পাতা হইয়াছে। এই জন্যই উপন্যাসের নামকরণ তাঁহার নামে, *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র চন্দ্রশেখর।

॥ ৬ ॥

গৃহ অরণ্য, প্রতাপহীন গৃহ আশ্রয় মাত্র, গৃহ নয়, সেই জন্য লরেন্স ফষ্টরের দেওয়া সুযোগ আসামাত্র অপহৃতা হইবার ছলে শৈবলিনী অসীম সাহসভরে, অতৃপ্ত হৃদয়াকাঙ্ক্ষা লইয়া গৃহত্যাগ করে। যদি গৃহ হইতে বাহির হইলে, অর্থাৎ স্বামীকে ত্যাগ করিলে প্রতাপকে পাওয়া যায়, এই আশায় শৈবলিনীর গৃহত্যাগ। অবোধ শৈবলিনী! গৃহত্যাগ করিলেই কি প্রতাপকে পাওয়া যাইবে? প্রতাপ কি সমাজ

সংসার, সম্মান, স্ত্রী ত্যাগ করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবে? গৃহত্যাগের সময় সকল কিছুই শৈবলিনীর নিকট অস্পষ্ট ছিল, বেগবান প্রেমপ্রবাহ তাহাকে গৃহ হইতে ভাসাইয়া লইয়া আসিয়াছে, কোন সুস্পষ্ট কোন পরিকল্পনা ছিল না; কেমন করিয়া প্রতাপের সহিত যোগাযোগ হইবে, গৃহী প্রতাপকে কিরূপে আপনার হৃদয়বেদনা জানাইবে, কিছুই তাহার জানা নাই। রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতার সেই চারি বৎসরের অবোধ বালিকাটির মতই শুধু স্নেহ অধিকার—

আমার আকাঙ্ক্ষা সম এমন আকুল,
এমন সকল বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর!

কিন্তু কঠিন আঘাতে এই ভ্রান্তি কাটিয়া যাইতে সময় লাগে না। শৈবলিনী ফষ্টরের নৌকায় আপনার কর্ম, ভাগ্য সম্পর্কে চিন্তা করিতেছে—"মনে করিয়াছিলাম গৃহের বাহির হইলেই প্রতাপকে দেখিব, মনে করিয়াছিলাম পুরন্দরপুরের কুঠিতে ফিরিয়া যাইব—প্রতাপের গৃহ এবং পুরন্দরপুর নিকট; কুঠির বাতায়নে বসিয়া কটাক্ষজাল পাতিয়া প্রতাপ পক্ষীকে ধরিব। সুবিধা বুঝিলে সেখান হইতে ফিরিঙ্গীকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাইব—গিয়া প্রতাপের পদতলে লুটাইয়া পড়িব। আমি পিঞ্জরের পাখী, সংসারের গতি কিছুই জানিতাম না। জানিতাম না যে মনুষ্য গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে, জানিতাম না যে ইংরেজের পিঞ্জরে, লোহার পিঞ্জরে—আমার সাধ্য কি ভাঙ্গি?" শৈবলিনী বুঝে নাই—প্রতাপকে পাইতে প্রতাপই বড় বাধা, ইংরেজ নয়। প্রতাপ কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া আপনার অজ্ঞাতে শৈবলিনী প্রতাপেরই গৃহে উপস্থিত। গত কয়েক দিনের শারীরিক ও মানসিক কষ্টের পরে নিরাপদ আশ্রয়ে আসিয়া শৈবলিনী একটু অন্যমনা। এটি প্রতাপেরই শয়ন কক্ষ, তাহার অজানা। প্রতাপ শৈবলিনীর উপস্থিতি না জানিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। পালঙ্কে শায়িতা শৈবলিনীকে দেখিয়া বিস্মিত, বিমুগ্ধ হইল। "দেখিয়া প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেননা। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া বা ইন্দ্রিয়বশ্যতা প্রযুক্ত যে তাহার চক্ষু ফিরিলনা এমত নহে—কেবল অন্যমনবশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের কথা তাহার মনে পড়িল—অকস্মাৎ স্মৃতি সাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।" সামান্য শব্দে অন্যমনা শৈবলিনী সজাগ হইল, প্রতাপকে দেখিল। শৈবলিনী আর চৈতন্য ধরিয়া রাখিতে পারিল না, মূর্ছা গেল। জ্ঞান ফিরিলে কিন্তু প্রতাপের নিকট কোন প্রশ্রয় পাইল না। প্রতাপ আত্মসংবরণ করিয়া স্থির হইয়াছে—"তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখ দর্শন করিতে নাই। তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম, আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর, এখানে কেন আনিলে?" আরও ক্রোধে প্রতাপ যখন বলে, "তোমার মরণই ভাল"; শৈবলিনী কাতর হয়। হায় কেন তবে সর্বস্ব ত্যাগ, হৃদয়ের দুরন্ত অশাসমূহ কি প্রতাপই পদদলিত করিবে? শৈবলিনী কাঁদিল। "রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল—আমার মরাই ভাল—কিন্তু অন্যে যাহা বলে বলুক—তুমি আমায় একথা বলিও না। আমার এ দুর্দশা কাহা হতে? তোমার হাতে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য দুঃখিনী হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য আমি গৃহধর্ম রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য। তুমি আমায় গালি দিওনা।"

এই কাতরতাপূর্ণ বাক্যের পরেও প্রতাপের ক্রোধ প্রশমিত হয়না। "প্রতাপ বলিলেন, তুমি পাপিষ্ঠা, তাই তোমায় গালি দিই। আমার দোষ! ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নহি।... তোমার নিজ হৃদয়ের দোষ—তোমার প্রবৃত্তির দোষ। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?" হায়, এই পুরুষের উক্তি! শৈবলিনীর তুমি কি করিয়াছ প্রতাপ? তুমি শৈবলিনীর সর্বস্ব হরণ করিয়া বসিয়া আছ। শৈবলিনীর সুখ, শান্তি, সংসার ধর্ম তোমার জন্যই মিথ্যা হইয়া গিয়াছে?

> শৈবলিনী গর্জিয়া উঠিল—তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেব মূর্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে, ও রূপের জ্যোতি আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম তো পাইলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?
>
> শুনিয়া প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল—তিনি বৃশ্চিকদংশের ন্যায় পীড়িত হইয়া, সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।

প্রতাপকৃত ভর্ৎসনায় শৈবলিনীর গর্জনটি মনোযোগ আকর্ষণ করে। শৈবলিনীর গৃহত্যাগ অপরাধ—সমাজ ও নৈতিকতার দিক হইতে। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে ভালবাসেন, বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে ত্যাগ করায় শৈবলিনীর চিত্ত একটু বেদনার্ত, মনে একটু অপরাধ বোধ আছে। না থাকিলে শৈবলিনী ছোট হইয়া যাইত। শরৎচন্দ্রের অভয়ার স্বামী ত্যাগে কোন বেদনা অথবা অনুতাপ ছিল না কারণ তাহার স্বামী মনুষ্যরূপী পশু। চন্দ্রশেখর পৃথক। আনা কারেনিনার সংসার ত্যাগেও বৃহৎ বেদনা ছিল, প্রেমিকের সাথে মিলন সেই বেদনাকে অপসারিত করিতে পারে নাই। আনার বেদনা সন্তানের সহিত বিচ্ছেদের বেদনা। সুতরাং গড়া একটি ঘর, সংসার ভাঙ্গে—প্রকৃতির নিয়মে অথবা প্রয়োজনেই ভাঙ্গে কিন্তু সাথে গভীর দুঃখও জড়াইয়া থাকে। শৈবলিনী দুইএর মধ্যে—চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের মধ্যে—প্রতাপকেই বাছিয়া নিয়াছিল। সেই দূর কালে, ধর্ম ও নৈতিকতার, সম্ভব ও অসম্ভবের সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া সে অনিশ্চিত পথে পা দিয়াছে প্রতাপের আশায়। শৈবলিনীর প্রতাপের প্রতি ভালোবাসার সহিত অপরিমিত সাহস ও দুর্জয় সংকল্প সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাই প্রতাপের উক্তিতে শৈবলিনীর গর্জন, ক্রোধ। তুমি শৈবলিনীকে গ্রহণ কর বা না কর, শৈবলিনী তোমারই জন্য পথে বাহির হইয়াছে, একথা প্রতাপকে সে দ্বিধা না রাখিয়া জানাইয়া দিতে চায়। প্রেমের এই জয় ঘোষণা আমাদের বিস্মিত করে, কারণ বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে পাপ পুণ্য সম্পর্কে বড় সচেতন। অথচ তাঁহারই বর্ণনার গুণে শৈবলিনীর মধ্যে পাপ খুঁজিয়া পাইনা। শৈবলিনী পাপীয়সী নয় শুধু এই কারণে যে সে সত্যভাষিণী। কপটতা তাহার চরিত্রে নাই।

॥৭॥

শৈবলিনী বঙ্কিমসৃষ্ট নারী চরিত্রসমূহে শ্রেষ্ঠ বলিবনা, কিন্তু সর্বাধিক বিচিত্র ও সাহসিকতাপূর্ণ। *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত পর্ব আছে। শাস্তি, বিধান ও গ্রহণের পরে সে চন্দ্রশেখরকে ভালোবাসিল বা পূজা করিল, তাঁহার গৃহে ফিরিয়া গেল। কিন্তু এইটিও আকস্মিক নহে। পূর্বে বলিয়াছি চন্দ্রশেখরে তাহার ভক্তি ছিল, চন্দ্রশেখরের গৃহের নিরাপত্তা, শান্তি সৌন্দর্য ও পবিত্রতা তাহার অন্তরে জাগরূক ছিল। সেই রাত্রিতে প্রতাপ ও দলনী বেগম ও তাহার সঙ্গীকে যখন ধরিয়া লইয়া গেল—শৈবলিনী তাহার জীবনের পূর্ব পশ্চাৎ ও ভবিষ্যৎ ভাবিতে বসিল। প্রতাপের গৃহে তখন একাকিনী, সহায়হীনা, প্রতাপ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এবার শৈবলিনী কী করে? প্রতাপের আশা যখন নাই, এবার আত্মহত্যা করা যাইতে পারে, এরকমও সে ভাবিল। কিন্তু প্রতাপের কী পরিণাম হয়—তাহা না জানিয়া সে মরিতে পারে না।

> প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা সে আমার কে? কে, তাহা জানি না সে শৈবলিনী পতঙ্গের জ্বলন্ত বহ্নি—সে এই সংসার প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ সে আমার মৃত্যু। আমি কেন গৃহত্যাগ করিলাম, ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম? কেন সুন্দরীর সঙ্গে গৃহে ফিরিলাম না?

এই একান্ত অসহায় অবস্থায় বেদগ্রামে চন্দ্রশেখরের গৃহের কথা শৈবলিনীর মনে পড়িল। গৃহ প্রাচীরের নিকটে স্বহস্তে রোপিত সেই করবীবৃক্ষ যাহার শাখা "রক্ত পুষ্প ধারণ করিয়া নীলাকাশকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া দুলিত," তুলসীমঞ্চ, সুমার্জিত প্রাঙ্গণ, গৃহ পালিত মার্জার, স্ফুটবাক পক্ষীর পিঞ্জর, সুনীল সুন্দর আকাশ, প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি, সুগন্ধি বায়ু—এ সকলই শৈবলিনী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। কত সম্মানের, কত নিশ্চিন্ত ছিল জীবন! "আমি তাঁহার যোগ্যা নহি বলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাতে কি তাঁহার কোন ক্লেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন? না—আমি তাঁহার কেহ নহি। পুঁতিই তাহার সব, তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না। একবার নিতান্ত সাধ হয়, সেই কথাটি কেহ আসিয়া আমাকে বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন। তাঁহাকে আমি ভালবাসি নাই—কখনও ভালবাসিতে পারিবনা—তথাপি তাঁহার মনে যদি ক্লেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারী হইল।" শৈবলিনীর সমস্যাটি জটিল—প্রতাপকে সে ভালোবাসে, কিন্তু স্বামীকে ভক্তি না করিয়াও পারে না। ভক্তির উপরে ভালোবাসারই জয়, কিন্তু স্বামীও আপনার গুণে ভক্তির আসনে আগাগোড়া প্রতিষ্ঠিত। চন্দ্রশেখরকে অন্য হইলে কালো বর্ণে অঙ্কিত করা হইত। কিন্তু বঙ্কিমের শিল্প জীবনের শিল্প। তাই সর্বরকমে ভক্তির পাত্র হইয়াও শৈবলিনীর ভালোবাসাতে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পরে শৈবলিনী যখন চন্দ্রশেখরের আশ্রয় গ্রহণ করিল, তখন ভক্তির সহিত নির্ভরতার যোগ হইল। কিন্তু আশাশূন্যতাই বড় কারণ। প্রতাপের আশা নাই, ভালোবাসা হারাইয়া গিয়াছে, চন্দ্রশেখরের উদারতা ও স্নেহ ছাড়া শৈবলিনীর আশ্রয় কোথায়? কিন্তু ইহার আগে শৈবলিনীর আরও কথা আছে। আপনার হৃৎপিণ্ডটি তাহাকে উৎপাটন করিতে হইয়াছে, প্রতাপ তাহাকে অঙ্গীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে সে প্রতাপের চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিবেনা। প্রতাপের শুভাশুভের সকল দায় নিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে প্রতাপের চিন্তা ছাড়িবে।

শৈবলিনীর সাহসের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে অনর্থক নহে। প্রতাপের গৃহ হইতে নবাব সকাশে নীত হইলে অন্তঃপুরবাসিনী রমণী হিসাবে শৈবলিনী ভীতা হইল না; নিজেকে প্রতাপের স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিল; প্রতাপের উদ্ধারের জন্য নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করিল। নবাব তাহাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিলেন ও তাহার সাহসিকতা, সংকল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া বলিলেন—"বিবি, স্মরণে রাখিও। কখনো যদি মুশকিলে পড়, তবে নবাব মীর কাসেমের কাছে আসিও।" আপন বুদ্ধিতে শৈবলিনী আমিয়ট ও গলষ্টন সাহেবকে পাগলিনী সাজিয়া ফাঁকি দিল, সুন্দর মুখটি দেখাইয়া বন্দি প্রতাপের নৌকাতে উঠিল। অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া প্রতাপের সম্মুখে আসিল। "প্রতাপের বিস্ময় অপনীত হইলে দেখিলেন, শৈবলিনী অধর দংশন করিতেছে, মুখ ঈষৎ হর্ষ প্রফুল্ল, মুখ মণ্ডল স্থির প্রতিজ্ঞার চিহ্নযুক্ত। প্রতাপ মানিল, এ বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে।" শৈবলিনীর বুদ্ধিতে আগে শৈবলিনী, পরে প্রতাপ জলে ঝাঁপ দিল। উভয়ে সন্তরণে পটু, অনুসরণকারীরা তাহাদিগকে ধরিতে পারিল না। সাঁতরাইয়া তাহারা নিরাপদ দূরত্বে গেল।

আবার সেই গঙ্গায় সাঁতার। বাল্যে কৈশোরে প্রতাপ ও শৈবলিনীর গঙ্গায় সাঁতারের কত সুখ স্মৃতি! শৈবলিনীর কাছে আবার লজ্জারও। প্রতাপ ডুবিয়াছিল, সে ডুবিতে পারে নাই।

> উভয়ে সন্তরণে পটু। সন্তরণে প্রতাপের আনন্দ সাগর উছলিয়া উঠিতেছিল। প্রতাপ ডাকিল—শৈ! শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে শৈ বা সই বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল! বহুকাল পরে! বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ। শৈবলিনী যত বৎসর সই শব্দ শোনে নাই, শৈবলিনীর সেই এক মন্বন্তর।

চন্দ্রালোকিত গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ ও শৈবলিনীর যুগল সাঁতার, প্রতাপের শৈ সম্বোধন বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় প্রণয় চিত্র। দুটি হৃদয় কত পথ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া, কত বিপদ দুর্ভাবনার পরে পরস্পরের নিকটে আসিয়াছে। প্রতাপের দোষ নাই—শৈবলিনীর ভালোবাসাকে সে দুর্গতি বলিয়াই জানে; প্রয়োজনে তিরস্কার করিতেও সে দ্বিধা করে না। কিন্তু বর্তমান মুহূর্তটি নিভৃত অবকাশ, কতকাল পরে একত্রে গঙ্গার জলে সাঁতার, শৈশবসঙ্গিনীর প্রিয় মুখখানি, সদ্য মুক্তি পাওয়ার আনন্দ প্রতাপকে সব ভুলাইয়া দেয়।

> তুমি গ্রাহ্য কর না কর, তাই বলিয়া জড় প্রকৃতি ছাড়েনা—সৌন্দর্যও লুকাইয়া রয়না। তুমি যে সমুদ্রে সাঁতার দাওনা কেন, জল—নীলিমার মাধুর্য বিকৃত হয় না—ক্ষুদ্র বীচির মালা ছিঁড়েনা—তারা তেমনি জ্বলে—তীরে বৃক্ষ তেমিন দোলে, জলে চাঁদের আলো তেমনি খেলে। জড় প্রকৃতির দৌরাত্ম্য!

প্রতাপ শৈ বলিয়া সম্বোধন করিল, পূর্ব সম্পর্ক স্বীকার করিল, আপনার স্নেহ প্রকাশ করিল, কিন্তু কর্তব্য ভুলিল না। প্রকৃতপক্ষেই প্রতাপের সম্মুখে কোন পথ খোলা ছিল কি? সে শৈবলিনীর প্রতি প্রণয়কে নিভৃত হৃদয়ে রাখিয়াছে সত্য, কিন্তু আপনার গৃহে ইহাকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে কি? শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের স্ত্রী, প্রতাপের গৃহে রূপসীর অধিষ্ঠান; প্রতাপের প্রতিষ্ঠা, সমাজ সংসারে তাহার কর্তব্য—প্রতাপ ইহাদের কোনটিকে অস্বীকার করে? উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেখিয়াছি আত্মবিসর্জনে প্রতাপ সকল দ্বন্দ্ব ও বেদনা হইতে মুক্তি পাইয়াছে। সেইজন্য দেখি গঙ্গার জলে সাঁতারকালে শৈ

সম্বোধন করিল প্রতাপ, কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইল না। উদ্দেশ্য শৈবলিনীর হৃদয়কে ফিরানো। কি করিলে শৈবলিনীর হৃদয় ফিরিবে? প্রতাপের জন্যই, কেবল প্রতাপের মঙ্গল কামনাতেই শৈবলিনীর হৃদয় ফিরিবে এই কথা প্রতাপ বুঝিয়াছিল। প্রকৃত বিচ্ছেদ ভিন্ন প্রতাপের মুক্তি নাই, শৈবলিনীর কল্যাণ নাই—এই মুক্তির মূল্য প্রাণ দিয়াও প্রতাপ রোধ করিতে প্রস্তুত। তাই প্রিয় সম্বোধন অন্তে প্রতাপ শৈবলিনীকে মনে করাইয়া দেয়—"মনে পড়ে—? তুমি ডুবিতে পারিলেনা—আমি ডুবিলাম?"

শৈবলিনীর বড় দুর্বল স্থানে এই আঘাত। প্রেমের জন্য প্রতাপ প্রাণ দিতে বসিয়াছিল, জীবনের মমতায় শৈবলিনী পারে নাই—বেদনা ও লজ্জায় সেই কথা শৈবলিনী কখনো বিস্মৃত হয় নাই।

প্রতাপের জিজ্ঞাসার উত্তরে শৈবলিনী বলিল—"মনে পড়ে। তুমি যদি আবার সেই নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে, তবে আজ তার শোধ দিতাম। কেন ডাকিলে?" প্রতাপ আপন মৃত্যুর ভয় দেখাইয়া শৈবলিনীকে এক কঠিন শপথ করিতে বলিল—

"ক শপথ প্রতাপ?"

প্র । এই গঙ্গার জলে—

শৈ । আমার গঙ্গা কি?

প্র । তবে ধর্ম্ম সাক্ষী রাখিয়া বল—

শৈ । আমার ধর্ম্মই বা কোথায়?

প্র । তবে আমার শপথ?

শৈ । কাছে আইস—হাত দাও।

প্রতাপ নিকটে গিয়া বহুকাল পরে শৈবলিনীর হাত ধরিল।...

শৈবলিনী বলিল, "এখন যে কথা বল, শপথ করিয়া বলিতে পারি—কত কাল পরে প্রতাপ?"

প্র । আমার শপথ কর, নহিলে ডুবিব। কিসের জন্য প্রাণ? কে সাধ করিয়া এই পাপ জীবনের ভার সহিতে চায়? চাঁদের আলোয় এ স্থির গঙ্গার মাঝে যদি এ বোঝা নামাইতে পারি, তবে তার চেয়ে আর সুখ কি?

উপরে চন্দ্র হাসিতেছিল।

প্রতাপকে এক প্রকার বুঝিতে পারা গেল। আট বৎসরের ব্যবধানে প্রতাপ শৈবলিনীকে হারাইবার বেদনা মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু শৈবলিনীর গৃহত্যাগ, অকুণ্ঠ প্রণয় ঘোষণা, শৈবলিনী কর্তৃক তাহার উদ্ধার, গঙ্গার জলে উভয়ের সাঁতার প্রতাপকে আবার বিচলিত করিল। সেই অবস্থা হইতেই শৈবলিনীকে সেই প্রিয় সম্বোধন! কিন্তু এই পর্যন্ত। চন্দ্রশেখরকৃত উপকার সে বিস্মৃত হইতে পারেনা, শৈবলিনীকে আবার চন্দ্রশেখরকে ফিরাইয়া দিতে চায়। কিন্তু তাহার পূর্বে শৈবলিনীর হৃদয় হইতে তাহাকে বিদায় লইতে হইবে, ইহা সে মর্মে মর্মে অনুভব করে। বেগবতী নদীর স্রোত কি ফিরে? শৈবলিনীর প্রেমের এই বেগবান স্রোতকে ফিরাইবার জন্য কঠিন শপথের প্রয়োজন। উপরে চন্দ্র, গঙ্গার জলে উভয়ের সাঁতার, প্রতাপ কতকাল পরে শৈবলিনীর হাতটি ধরিয়াছে—কিন্তু অবিমিশ্র

আনন্দ নাই, প্রণয়ের আশ্বাস নাই। প্রতাপ হয় বিস্মৃতি, নয় মৃত্যুর কথা বলে—প্রতাপের কাছে এই বেদনাকর জীবনের বোঝা চাঁদের আলোতে ভরা গঙ্গায় নামাইতে পারাই সুখের। হাতে হাতটি ধরা, গঙ্গার স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, উপরে চন্দ্র হাসিতেছে, প্রতাপ বলিল—

> শপথ কর, আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর—আমার মরণ-বাঁচন শুভাশুভের তুমি দায়ী—
>
> শৈ । তোমার শপথ—তুমি যা বলিবে ইহজন্মে তাহাই আমার স্থির।
>
> প্রতাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিল। সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে অতিশয় কঠিন, অতিশয় রুক্ষ, তাহার পালন অসাধ্য, প্রাণান্তকর; শৈবলিনী শপথ করিতে পারিল না। বলিল, "এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে প্রতাপ?"
>
> প্র । আমি!
>
> শৈ । তোমার ঐশ্বর্য্য আছে। বল আছে— কীর্ত্তি আছে— বন্ধু আছে— ভরসা আছে— রূপসী আছে— আমার কি আছে প্রতাপ?
>
> প্র । কিছু না—আইস তবে দুইজনে ডুবি।

কৈশোরে প্রতাপ শৈবলিনী তাহাদের প্রেমের ভবিষ্যৎ নাই বুঝিয়া একত্রে ডুবিয়া মরিতে চাহিয়াছিল। প্রতাপ আবারও জীবনের ভার নামাইতে প্রস্তুত, শৈবলিনীরও গতি নাই; পরস্পরের হাত ধরিয়া সেই গঙ্গার জলে জীবনব্যাপী ব্যর্থতার বোঝা নামাইবার আর উপযুক্ত সময় কি? কিন্তু না, এই আট বৎসরে গঙ্গায় অনেক জল বহিয়া গিয়াছে—শৈবলিনী ভাবিল, "আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন?" বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "তাহার জীবন নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল।" শৈবলিনী বালিকা বয়সে আপনার প্রাণের মমতা করিয়াছিল, ডুবিতে পারে নাই। এবারও সে ডুবিল না—তবে আপনার প্রাণের জন্য নহে, প্রতাপের জন্য। এইবার সে প্রতাপের প্রাণ রক্ষা করিল—কিন্তু অন্য অর্থে আপনার প্রাণ দিয়াই। শৈবলিনী বলিল,

> "প্রতাপ, হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ, শুন, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ-বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি। আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"
>
> শৈবলিনী প্রতাপের হাত ছাড়িয়া দিল। কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল।
>
> প্রতাপ গদগদকণ্ঠে বলিল—"চল তীরে উঠি।"
>
> উভয়ে গিয়ে তীরে উঠিল।

প্রতাপ শৈবলিনীর প্রণয় পরিণাম এই পর্যন্ত। শৈবলিনী আপনার হৃৎপিণ্ড উপড়িয়া ফেলিল, প্রতাপের মরণ-বাঁচন শুভাশুভের দায় যেহেতু তাহাতে বর্তিল—প্রতাপের চিন্তা ছাড়িবার শপথ না করিয়া পারে কি? প্রতাপের জন্যই প্রতাপকে ভুলিবার শপথ করিল, এবং "আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।" শৈবলিনীর ধর্ম নাই, গঙ্গা নাই—শুধু প্রতাপ ছিল, প্রতাপও নয়, প্রতাপের চিন্তা ছিল, প্রতাপের আশা ছিল; প্রতাপ তাহার এই আনন্দও কাড়িয়া লইল। শৈবলিনী প্রতাপকে বলিয়াছিল—'আমার সর্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ'। বালিকা বয়সেই চন্দ্রশেখরের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, সংসার সুখ হয় নাই,

প্রতাপের স্মৃতিই তাহার নিজস্ব ছিল। সেই 'সর্বস্ব' এবার গেল। সুতরাং শৈবলিনী গঙ্গার জলে ডুবিলনা প্রেমের জন্য, প্রতাপের জন্য আরও কঠিন মৃত্যু বরণ করিল—সেই মৃত্যু প্রতাপকে ইচ্ছাপূর্বক বিস্মরণ। অথচ প্রতাপের হাত ধরিয়া গঙ্গার জলে চাঁদের আলোয় মৃত্যু কত সুখের হইত! প্রতাপ জানিলও না তাহার মহত্ত্বের জন্য কত বড় মূল্য শৈবলিনীকে দিতে হইল।

॥ ৮ ॥

প্রতাপকে ভুলিতে হইলে প্রতাপের সংসর্গ ত্যাগ করা প্রয়োজন। হৃদয়ের তীব্র যাতনা ও হতাশা হইতে সাময়িক মুক্তি পাওয়ার জন্য শৈবলিনী প্রথম সুযোগেই তীরে নামিয়া পলায়ন করিল।

> এবার শৈবলিনী অসদভিপ্রায়ে পলায়ন করে নাই। যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। প্রাণভয়ে শৈবলিনী সুখ সৌন্দর্য্য প্রণয়াদি-পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল। সুখ, সৌন্দর্য্য, প্রণয়, প্রতাপ—এসকলে শৈবলিনীর অধিকার নাই—আশা নাই—আকাঙ্ক্ষাও পরিহার্য—নিকটে থাকিলে কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে? মরুভূমে থাকিলে কোন তৃষিত পথিক, সুশীতল স্বচ্ছ সুবাসিত বারি দেখিয়া পান না করিয়া থাকিতে পারে?

সুতরাং "শৈবলিনী যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।" শৈবলিনীর পরাজয় আমরা দেখিলাম। সংসারবন্ধনের নিকট নয়, আপনার প্রেমের নিকট শৈবলিনী পরাজিত হইল। প্রতাপকে বাঁচাইতেই সে ফিরিল। দেশে রাষ্ট্র হইল শৈবলিনী মরিয়াছে। প্রতাপের অন্তরে দুঃখ হইল, ইহার অধিক কিছু বুঝা গেলনা। তাহার মৃত্যু সংবাদে দুঃখিত হইয়াও সুন্দরী যথার্থই বলিল— "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। কিন্তু শৈবলিনী এখন সুখী হইল। তাঁহার বাঁচা অপেক্ষা মরাই যে সুখের, তা আর কোন মুখে না বলিব।" কিন্তু শৈবলিনী তো মরিলনা, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতনভাবে গড়িতে চাহিলেন।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড প্রায়শ্চিত্ত। শৈবলিনীর স্বামীত্যাগজনিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রায়শ্চিত্ত পর্বের জন্য নিন্দিত হন। রোহিনীকে মারিবার জন্য নিন্দিত হইয়াছিলেন, কুন্দনন্দিনীর বিষপান, শৈবলিনীর নরকদর্শন উন্মাদ অবস্থা—ইহাও নিন্দার কথা। বঙ্কিম উপন্যাসের অনেক গুণ। তাহার মধ্যে একটি এই যে, যে জীবন সমস্যা উপন্যাসে উপস্থাপিত হয় তাহার কার্যকারণের ব্যাখ্যাও তিনি করেন। কুন্দনন্দিনী ঔপন্যাসিকের আদেশে বিষপান করে নাই, নগেন্দ্রের নিষ্ঠুর অবহেলা তাহাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করিয়াছিল— "এখন আর কোন সুখের আশায় প্রাণ রাখি?" রোহিনীর গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে মরিতে না হইলেও তাহার দিন ফুরাইয়া ছিল। গোবিন্দলালের পদাঘাতই মৃত্যুর অধিক শাস্তি। শৈবলিনীর স্বামীগৃহে প্রত্যাগমনেরও একটা ব্যাখ্যা আছে। পূর্বে বলা হইয়াছে, ভাল না বাসুক চন্দ্রশেখরের প্রতি শৈবলিনীর শ্রদ্ধা ছিল। আট বৎসরের বিবাহিত জীবনে চন্দ্রশেখরের উদারতা, স্নেহ শৈবলিনীর অজ্ঞাত ছিল না। মহাকায় পুরুষ পলায়নের সেই দুর্যোগের রাত্রিতে শৈবলিনীকে বহন করিয়া পর্বত গুহায় রাখিয়া গিয়াছেন। চারিদিকে অন্ধকার,

শৈবলিনীর হৃদয়েও কোন আলো নাই, সেই সময়ে একবার বুঝি চন্দ্রশেখরকে স্মরণ করিয়াছিল—তিনি তো কোন অপরাধ করেন নাই। তখন তাহার গার্হস্থ্য সুখপূর্ণ বেদগ্রামে পতিগৃহ স্মরণ হইতেছিল, যদি আর একবার সে সুখাগার দেখিয়া মরিতে পারি, তবুও সুখে মরিব।" দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা রক্ষা বঙ্কিমের অভিপ্রেত ছিল। পবিত্রতা নষ্টের কারণে পুরুষেরও তিনি কম শাস্তি বিধান করেন নাই। সুতরাং শৈবলিনীকেও তিনি প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়া মুগ্ধ করিতে চাহিবেন—ইহাতে আর আশ্চর্য কি?

অসহায়, পুণ্যহৃদয়া শৈবলিনীর এবার 'প্রায়শ্চিত্ত' শুরু। নরকের বর্ণনা—রুধিরের নদী, গলিত শব, স্রোতবাহিত কঙ্কালের মালা, অস্থিময় কুম্ভীরসকল, মহাপুরুষ কর্তৃক জ্বলন্তলৌহনির্মিত বেত্রাঘাত, ভয়ানক পূতি গন্ধ, হৃদয়বিদারক আর্তনাদ—নরকের সহিত এইরূপ পরিচয় স্বপ্নমধ্যে শৈবলিনীর হইল। মহাপুরুষের তিরস্কার, এই নিদারুণ অভিজ্ঞতা শৈবলিনীর জন্মান্তর ঘটাইল বলা যায়। সাতদিন স্বামীর চিন্তা মনে রাখিয়া শৈবলিনী স্বামীকে ভালবাসিল। আশ্রয়হীন, সহায়হীন শৈবলিনীর কি পরিণতি হইতে পারিত? আগে, স্বামীকে ভালো না বাসুক, প্রতাপকে ভুলিবার শপথ লইয়াছিল—এখন সাতদিন অবিচ্ছিন্ন স্বামী চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া স্বামীকে অন্তরে অনুভব করিল—"ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ, মন নিরুদ্ধ সর্বত্র স্বামী। স্বামী চিত্তবৃত্তিসমূহের একমাত্র অবলম্বন হইল"। শৈবলিনীর শুদ্ধি সম্পূর্ণ হইল। অনুতাপের পথে স্বামীর স্নেহলাভের ইঙ্গিত।

চন্দ্রশেখর বিশালহৃদয় ছিলেন, শৈবলিনীতে তাঁহার সত্য স্নেহ ছিল, তাঁহার কাছে একবার পৌঁছিলে তিনি ফিরাইয়া দিবেন না— বিশেষ করিয়া যখন শৈবলিনীর দেহের পবিত্রতা নষ্ট হয় নাই। কিন্তু অন্তরে শৈবলিনী স্বামী ভিন্ন অন্যপুরুষে আসক্তা ছিল বলিয়া তাহার শুদ্ধি অথবা লেখকের ভাষায় প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল। প্রায়শ্চিত্ত কিছুই নয়—অনুতাপ।

আপাতত শৈবলিনীর শূন্য অন্তরে চন্দ্রশেখরের প্রতিষ্ঠা হইল। সেই সাতদিনে চন্দ্রশেখর স্মরণে শৈবলিনী আপনার ভুল বুঝিতে পারিল—প্রতাপ অপেক্ষা চন্দ্রশেখরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল—"শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।" কতদূর সত্য, কত দিনের জন্য সত্য? ভ্রান্ত মানব হৃদয়! বারে বারেই ভুল করিবে। শেষ পর্যন্ত হৃদয়ের এই টানাপড়েন, যন্ত্রণার কারণেই শৈবলিনীর উন্মাদগ্রস্ততা।

॥ ৯ ॥

চন্দ্রশেখরের মহত্ত্ব স্মরণ রাখা দরকার। শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার পূর্বের স্নেহ ছিলই—এখন এই উন্মাদিনীর ভার তিনি গ্রহণ না করিয়া পারেন না। গুরুর উপদেশমত শৈবলিনীকে বেদগ্রামে আনিলেন, গৃহ সংস্কার করিয়া শৈবলিনীকে সেখানে রাখিলেন, শৈবলিনীর উন্মাদ অবস্থায় চন্দ্রশেখরের শোকানুভব আন্তরিক। "চন্দ্রশেখর রোদন করিলেন। অতি মৃদু স্বরে, কত আদরে ডাকিলেন—শৈবলিনী!" তাঁহার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ করিবার নয়। বেদগ্রামের গৃহে উন্মাদিনী শৈবলিনীর উপর যোগবল পরীক্ষা করা হইল, উদ্দেশ্য সত্য উদ্‌ঘাটন ও তাহার চিকিৎসা। চন্দ্রশেখরের গুরু রমানন্দ স্বামীও শৈবলিনীর প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করিলেন। যোগবল অথবা Psychic Force যাহাই

হউক—শৈবলিনীর ক্ষেত্রে ভালো কাজ করিল। ঔষধ ও সম্মোহনের প্রভাবে শৈবলিনী নিদ্রিত হইলে চন্দ্রশেখর সকল তথ্যাদি জানিতে চাহিলেন। শৈবলিনী কিছু গোপন করিল না, গোপন করিবার শক্তি তাহার ছিল না।

চ । তুমি ফষ্টরের সঙ্গে গেলে কেন ?

শৈ । প্রতাপের জন্য।

চন্দ্রশেখর চমকিয়া উঠিলেন— সহস্র চক্ষে বিগত ঘটনা সকল পুনর্দ্দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতাপ কি তোমার জার ?"

শৈ । ছি! ছি!

চ । তবে কি ?

শৈ । এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম— ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন?

চন্দ্রশেখর অতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধিতে কিছু লুক্কায়িত রহিল না।...

গঙ্গার বক্ষে সাঁতার কালে তাহাদের কথোপকথন শুনিলেন। শুনিয়া চন্দ্রশেখর প্রতাপকে মনে মনে অনেক সাধুবাদ দিলেন।

শৈবলিনীর সহিত ফষ্টরের দেহ সম্পর্ক হয় নাই জানিলেন। প্রতাপকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করার জন্য সে পাপিষ্ঠা, নচেৎ সম্পূর্ণ সতী এই কথাও বিশ্বাস করিলেন।

শৈবলিনীর কী ভবিষ্যৎ, কী তাহার ইচ্ছা ?

চ । আরোগ্য লাভ করিলে কোথা যাইতে ইচ্ছা কর ?

শৈ । যদি বিষ পাই ত খাই—কিন্তু নরকের ভয় করে।

চ । মরিতে চাও কেন ?

শৈ । এ সংসারে আমার স্থান কোথায় ?

চ । কেন, আমার গৃহে ?

শৈ । আপনি আর গ্রহণ করিবেন ?

চ । যদি করি ?

শৈ । তবে কায়মনে আপনার পদসেবা করি। কিন্তু আপনি কলঙ্কী হইবেন।

লক্ষ করা দরকার—উন্মাদ অবস্থায় শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে ভালোবাসার কথা অনেক ভাবিয়াছিল। প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালোবাসিয়াছিল। কিন্তু এখন ঔষধ প্রভাবে, হৃদয়ের শান্ত অবস্থায়, গৃহীতা হইলে শুধু পদসেবা, স্ত্রীর কর্তব্যের কথাই বলিল। চন্দ্রশেখরের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া শৈবলিনীর বিকল্প কোন পথ নাই—এই কথা বুঝিতে হইবে। চন্দ্রশেখরের মহত্ত্ব, শৈবলিনীর প্রতি ভালোবাসা উপন্যাসের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। "আপনি কলঙ্কী হইবেন" ইংরেজ কর্তৃক অপহৃতা স্ত্রীকে সংসার ধর্মে ফিরাইয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে—একশত বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে সমাজ, ধর্ম ও নীতিবোধ স্মরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন, আনন্দিত মনেই লইলেন। প্রতাপের সহিত দেখা হইলে তাহাকে সাধুবাদ দিলেন—এবং "চন্দ্রশেখর

বাষ্প গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, এক্ষণে জানিলাম যে, ইনি নিষ্পাপ। যদি লোক রঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া ইঁহাকে গৃহে লইব।" তিনি অপবাদের জন্য সীতা বিসর্জন দিলেন না।

॥ ১০ ॥

কিন্তু শৈবলিনীর আন্তর সমস্যা তো মিটিল না। এত দুঃখ দহনের পরেও তো প্রেম পরাজিত হয় না। সুস্থ হইয়া, জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া আবার যে শৈবলিনী সে শৈবলিনী। রণক্ষেত্রের প্রান্তে, যখন মনে হইয়াছিল স্বামী সংসার ফিরিয়া পাইয়া তাহার সব সমস্যা মিটিয়াছে তখন—শৈবলিনী ও প্রতাপের কথোপকথন—

শৈ। স্বামী যদি আমায় পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন, তবে মনের পাপ আবার লুকাইয়া রাখিয়া, তাঁহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া কি উচিত হয়?

প্র। কি করিতে চাও?

শৈ। পূর্ব্বকথা সকল তাঁহাকে বলিয়া, ক্ষমা চাহিব।

প্রতাপ চিন্তা করিলেন, বলিলেন, "বলিও! আশীর্ব্বাদ করি তুমি এবার সুখী হও।" এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শৈ। আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—

প্র। সে কি শৈবলিনী?

শৈ। যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কত দিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।

প্রতাপ আর উত্তর করিলেন না। দ্রুতপদে অশ্বারোহণ করিয়া, অশ্বে কশাঘাতপূর্ব্বক সমর ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

প্রতাপ চন্দ্রশেখরের প্রতি ভক্তিতে, শৈবলিনীর প্রতি প্রীতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিল।

চন্দ্রালোকিত নদীবক্ষে শৈবলিনী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল প্রতাপকে ভুলিবে। তাহার দীর্ঘ প্রায়শ্চিত্ত হওয়ার পরে, প্রতাপের প্রতি তাহার সাবধান বাণীর প্রয়োজন ছিল না। 'যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে' এই ইঙ্গিতময় উক্তি প্রতাপকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। 'স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার' শক্তিময়ী শৈবলিনী সম্পর্কে একথা খাটে না। শৈবলিনী অন্তর হইতে প্রতাপকে কখনই নির্বাসন দিতে পারিবেনা। আপনার এই হৃদয়াবস্থা প্রতাপকে জানানোতেই শৈবলিনীর সুখের জন্য প্রতাপ যুদ্ধে একপ্রকার আত্মাহুতি দিল। প্রতাপের মরণ বাঁচন, শুভাশুভের দায় শৈবলিনী রক্ষা করিতে পারিল না।

বৎসর কাল অথবা তারও বেশি সময় পরে বেদগ্রামের চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর গৃহ প্রাঙ্গণ। তেমনই সুমার্জিত, পুষ্পতরুতে শোভিত ও সুবাসিত, পিঞ্জরের স্ফুটবাক পক্ষ এখনও হয়ত নির্জন গৃহের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে। করবীর রক্তশীর্ষ শাখা এখনও হয়ত নীল আকাশকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া আপন মনে দোলে। শৈবলিনী গৃহকর্ম করে, ভীমা দীঘি হইতে নিত্য জল আনে, স্বামীর সেবায় নিজেকে

নিয়োজিত রাখে। শৈবলিনীর মনের কি ভাব ? স্বামী ক্ষমা করিয়া সাদরে গৃহে প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন, সেই জন্য নিজেকে ভাগ্যবতী ভাবে কি ? চন্দ্রশেখর তো অবহেলার পুরুষ নহেন—তাঁহার প্রণয়ে শৈবলিনী নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবেই না কেন ? সুতরাং জীবন চলিবে, শৈবলিনীর বয়স বাড়িবে; হয়ত দুই একটি পুত্র কন্যা জন্মিবে; শিশুর কলকণ্ঠ, হাসি, আবার শৈবলিনীর মুখে হাসি ফুটাইবে।

কিন্তু ইহা বাহিরের চিত্র—চন্দ্রশেখরের সংসারের চিত্র। ভিতরে শৈবলিনী স্তব্ধ, বক্ষে পাষাণভার। একদিন প্রতাপ এক সাথে ডুবিয়া মরার ডাক দিয়াছিল, শৈবলিনী মরিতে পারে নাই। প্রতাপ দৈবক্রমে বাঁচিয়াছিল। শৈবলিনী কেন, কোন দুরাশায় গৃহত্যাগ করিয়া সত্য সত্যই প্রতাপের মৃত্যুর কারণ হইল ? প্রতাপ তাহারই সুখের জন্য, তাহাকে গৃহে স্থিত করার জন্য প্রাণ দিল। দিন যায়, দিন আসে, শৈবলিনী প্রতাপের নাম মুখেও আনে না, কিন্তু অব্যক্ত বেদনায় তাহার হৃদয় সাড়হীন। প্রাণের অপেক্ষা যে প্রিয়—শৈবলিনী তাহাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিল ? আর সে রহিল বাঁচিয়া, সুখে সংসার করিবার জন্য ?

সুতরাং কল্পনা করিতে পারি—শক্তি ও স্নেহময়ী বলিয়াই শৈবলিনী আত্মহত্যা করিবেনা, চন্দ্রশেখরকে দ্বিতীয়বার সে আঘাত দিবে না—বাঁচিয়াই সে থাকিবে, আপনার কর্তব্য পালন করিয়া যাইবে। কিন্তু এই শৈবলিনী আগের শৈবলিনীর ছায়া মাত্র, জীবনবীণার তারটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেই মধুর সংগীত তেমন করিয়া আর বাজিবে না। চন্দ্রশেখর কি বুঝিতে পারিবেন না ? হয়ত পারিবেন, কিন্তু অসীম ক্ষমা ও স্নেহে এই শৈবলিনীকেই ভালোবাসিবেন; শৈবলিনীর জন্য সান্ত্বনার আশ্রয়টি ভাঙ্গিবেন না।

জীবন এই রকমই। ক্ষতি, অপরাধ, অপ্রাপ্তি সত্ত্বেও মানুষ সামনে চলিতে থাকে, পথ ফুরায়। শৈবলিনীর পথও একদিন ফুরাইবে।

তথ্যনির্দেশ

১. 'শ্রীমদ্ভবগদ্‌গীতা', ভূমিকা, *বঙ্কিমরচনাবলী*, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ : ১৩৯২, পৃ. ৬৮১

২. *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসের সকল উদ্ধৃতি *বঙ্কিমরচনাবলী*, ১ম খণ্ড, (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বাদশ প্রকাশ : ১৩৯৫) হইতে লওয়া হইয়াছে।